মাস্টার মশায়

(গল্পগ্রন্থ – বেণীগীর ফুল বাড়ি)

প্রশান্তবাবুর কথা আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে।

সেদিন যেন কিসের ছুটি ছিল। বিকেলবেলা আমি ইস্টিশানের ধারে বেড়াতে যাচ্ছিলুম। বিকেলবেলা আমি প্রায়ই ইস্টিশানে বেড়াতে যেতুম, বিশেষত ছুটির দিনে। হিস্ হিস্ করে স্টিম ছাড়ে, খট্ খট্ করে গাড়ি চলতে থাকে, মাঝে মাঝে বিকট শব্দেসিটি দেয়। রেলের পুলের ওপর বসে আমার সেই সব দেখতে বেশ ভাল লাগত।

সন্ধ্যা হতে তখন অনেক দেরি আছে। পশ্চিম আকাশে লাল সূর্য যেন ফাগ ছড়িয়ে চারিদিক ভরিয়ে দিচ্ছে। কর্মব্যস্ত পৃথিবীর মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ধীরে ধীরে নিঃশব্দতায় ধরিত্রী ভরে যাচ্ছে। আশেপাশের ঝোপঝাপ থেকে পাখিদের কিচির কিচির শব্দ ভেসে আসছে। আমি আঁকাবাঁকা মেঠো পথ বেয়ে পাকা কাঁঠালের তীব্র গন্ধে চিত্ত মদির করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি।

এমন সময় কলকাতা থেকে ট্রেনখানা এসে প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়াল। সে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সশব্দে হাঁফ ছাড়তে লাগল। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে তার বিশ্রাম নেবার অধিকার। এই ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত কয়টির মধ্যে সকলের ওঠানামা শেষ করতে হবে। যথাসময়ে গাড়ি পুনরায় ছেড়ে দিল। সে ঝিক্ ঝিক্ করতে করতে সরু ফালি লাইনের ওপর দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ধূম নির্গত করে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল। তার পেছনের লাল আলোটা বহুক্ষণ ধরে দেখতে পেলুম। আম কাঁঠালের বাগানের ধার দিয়ে, বাঁশ ঝোপের পাশ বয়ে, সবুজ ধান ক্ষেতের কোণ ধরে, পানের ঝাড় পেছনে ফেলে সশব্দে ট্রেন এগিয়ে গেল।

কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে একটি ভদ্রলোক ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে এলেন। বেশ সুপুরুষ চেহারা, বয়স বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, খুব ফর্সা, চোখে সোনার চশমা। গ্রামের মধ্যে কোথাও তাঁকে দেখেছি বলে মনে হয় না। অবাক হয়ে তাঁর পানে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলুম। আশ্চর্য! তিনি আমার কাছেই এগিয়ে এলেন, এমন কি তিনি আমাকেই প্রথমে সম্বোধন করলেন, শোন খোকা।

আমার চিত্ত পরম শ্রদ্ধায় ভরে গেল। বিনীত কণ্ঠে বললুম, আজ্ঞে।

তিনি বললেন, তুমি বুঝি এখানে থাক?

বললুম, হাঁ।

তিনি বললেন, বিষ্ণুপুর হাইস্কুল কোথায় বলতে পার?

বললুম, এই তো আমাদের স্কুল, চলুন না নিয়ে যাচ্ছি।

তিনি বললেন, ওঃ, তুমি বুঝি ওই স্কুলে পড়?

আমি গর্ব অনুভব করলুম। তিনি বললেন, কোন্ ক্লাসে পড়?

বললুম, ক্লাস সেভেনে।

তিনি বললেন, বেশ বেশ, তোমার নাম?

বললুম, শ্রীমান নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কথায় কথায় আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, গ্রামের মধ্যেই প্রায়। একটা মোড় বাঁকতেই স্কুল দেখা গেল। বললুম, ওই দেখুন, আমাদের ইস্কুল—ওই সাদা রঙের দোতলা বাড়িটা। আপনি কোথায় যাবেন? ইস্কুল তো এখন বন্ধ!

তিনি বললেন, আমি যাব আশু চৌধুরীর বাড়ি।

আমি বললুম, ওঃ! আপনিই বুঝি আমাদের নতুন হেড্মাস্টার?

তিনি স্মিতমুখে বললেন, হাঁ, কেন বল তো?

আশ্চর্য! আমি এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলেছি? প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায় এম.এ. আমাদের নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক। আমি নিবিড় শ্রদ্ধায় তাঁর পদধূলি মাথায় নিলুম। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, থাক্ থাক্ থাক্।

আজও আমি সেদিনের কথা ভুলতে পারি নি। তার সেই সৌম্য মূর্তি, মধুর ভাষা আমার স্মৃতিপটে দুরপনেয় রেখাপাত করে গেছে।

স্কুলে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেল। আগেকার বুড়ো হেডমাস্টারের পরিবর্তে প্রশান্তবাবুকে পেয়ে অনেকে স্বস্তি বোধ করল। উঁচু ক্লাসের বড় বড় ছেলেরা তো হেসেই ফুঁ করে উড়িয়ে দিল। বলল, আরে ছ্যা! ও আবার হেডমাস্টারি করবে! ডিসিপ্লিন কাকে বলে তাই হয়তো জানে না। অতটুকু হেডমাস্টারকে কে-ই বা মানবে? কি বলিস্ বক্কেশ্বর?

বক্কেশ্বর তুড়ি দিয়ে বলল, আরে এমন অবনীবাবুকে ঘাল করে দিলাম তার আবার প্রশান্ত মুখুজ্জে এম.এ.। মাত্তর দু'দিন, তারপর দেখে নিস্, বাছাধনকে বুঝিয়ে দেব আমরা হচ্ছি ইস্কুলের লিডার। নে নে ভোলানাথ, একটা গান ধর।

সঙ্গীতজ্ঞ ভোলানাথ বলল, ইস্কুলে বসে গান?

বক্কেশ্বর বলল, আরে গর্দভ, টিফিনের সময় গাইবি তো তাতে কি হয়েছে? নে সেই গানটা আরম্ভ কর, সেই 'ভুলি ভুলি করে ভুলিতে নারি'...

অগত্যা ভোলানাথ গলা ছেড়ে গান ধরল। গায়ক ভোলানাথের স্কুলে বেশ নাম আছে। আমি জানালার ফাঁক দিয়ে দেখছিলুম। সেখানে ঢোকবার হুকুম নেই কারণ সে হচ্ছে বড়দের আসর। গান বেশ তালে তালে চলতে লাগল। এমন সময় কোথা থেকে হেডমাস্টার মশাই সেখানে নিঃশব্দে এসে হাজির হলেন। কে যেন ভোলানাথের গলাটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরল। লিডারদের মুখ শুকিয়ে পাংশু হয়ে গেল। তাদের বীরত্ব আস্ফালন চিরতরে অস্তমিত হলো। হেডমাস্টার মশায় ভোলানাথের কান ধরে দাঁড় করিয়ে তার দুগালে ঠাস্ ঠাস্ করে দুটো চড় মেরে বললেন, এটা বাগানবাড়ি নয়!

তারপর অন্যান্য শ্রোতাদের এক এক চড় মেরে তিনি যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমন নিঃশব্দে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। লিডারদের তখন রক্ত গরম হয়ে গেছে। কেউ বলল, সেক্রেটারির কাছে অ্যাপ্লিকেশন করবে। কেউ বলল, মজা দেখাবে।

কিন্তু কারুর মজা দেখাতে কিংবা অ্যাপ্লিকেশন করতে সাহস হল না। পরন্তু সকলে একবাক্যে স্বীকার করল যে হেডমাস্টার মশাই ভারী রাশভারী এবং কড়া মেজাজের লোক। বাস্তবিক ইস্কুলের সকলেই তাকে রীতিমত সমীহ করে চলত।

অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামময় তাঁর সুনাম রটে গেল আদর্শ শিক্ষক হিসেবে। তাঁকে সকলে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে লাগল। তিনি ছিলেন ছাত্রদের সাহায্যের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। যে যখন যা প্রশ্ন করত তিনি তখনই তার উত্তর দিতেন। ছেলেদের মঙ্গলের জন্যেতিনি সব সময়ে উন্মুখ ছিলেন।

তাঁর মধ্যে কোথাও একটুকু গর্ব ছিল না। তাঁর মুখ কোনসময়ে হাস্যমধুর, কোনসময়ে বা গাম্ভীর্যে অটল-প্রায়। সেই যে কথা আছে না 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি', হেডমাস্টার মশায় ছিলেন ঠিক সেই রকম। ছেলেরা কোনো অন্যায় করলে তিনি তখন কঠোর শাস্তি দিতেন, আবার ছেলেরা কোনো ভাল কাজ করলে তিনি তাদের প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন।

মাস কয়েক পরে শুনলুম তাঁর নাকি বিয়ে, এমন কি আমারই কাকার মেয়ে উষার সঙ্গে। উষাকে দেখতে ছিল ফুটফুটে ফুলের মত। দুজনকে চমৎকার মানায়। হারান চক্কোত্তি বললেন, অমন সোনার টুকরো মাস্টারকে সংসারী না হলে কি মানায় মুখুজ্জে মশাই? আমরা থাকতে এমনি করে ভেসে ভেসে বেড়াবে?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, কিন্তু বিয়ে যে করতে চাইছে না।

চক্কোত্তি বললেন, ক্ষ্যাপা! বিয়ে কর বল্লেই বুঝি ছেলেরা রাজি হয়? কলিকালে সব উলটে গেছে। ওরা মুখে প্রথমে ওরকম বলে থাকে। তুমি দেখে নিয়ো, ও বিয়ে করবে। আরে দাদা, বিয়ে করতে কার না ইচ্ছে যায়? দেখে নিয়ো, চাটুজ্জের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবই দেব।

যথাসময়ে তাঁরা হেডমাস্টার মশায়ের কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লেন। কিন্তু হেডমাস্টার মশাই প্রথমে বিনীতভাবে তাদের প্রস্তাব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। অথচ গ্রামের লোকও কেউ সহজে ছাড়ল না। হেডমাস্টার মশাই বললেন, দেখুন আমার আত্মীয়স্বজন এখানে কেউ নেই। এখানে বাড়ি ঘর-দোরও নেই। আমি থাকি পরের বাড়ি। এখন আমার বিয়ে করা সাজে না।

রায়মশাই বললেন, বাড়ির জন্যে ভাবতে হবে না মাস্টার মশাই। আমার একটা বাড়ি তো অমনি অমনি পড়ে রয়েছে। উঠবেন সেখান গিয়ে।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, আপনি আমায় নয় আজ থাকতে দিলেন, নয় ধরুন কাল থাকতে দিলেন; কিন্তু চিরকাল কি আশ্রয় পাব?

রায়মশাই বললেন, আশ্রয় দেওয়া কার সাধ্যি বলুন মাস্টার মশাই। আপনি নয় এক কাজ করতে পারেন, মাসে মাসে কিছু ভাড়া দেবেন, তা হলেই হবে। যতদিন বাড়ি থাকবে, যতদিন আপনি এখানে থাকবেন ততদিন আপনি ওখানে বাস করবেন।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, শুধু তাই নয়, আমার বিয়ে দেবেই বা কারা?

রায়মশাই বললেন, তার জন্যে ভাববেন না। আমার বাড়ির মেয়েরা গিয়ে আপনার বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবে। আপনি কেবল সাতপাক ঘুরে আসবেন, ব্যস্; মানে গরিবের কন্যাদায় থেকে উদ্ধার দেওয়া।

অগত্যা মাস্টার মশাইকে বাধ্য হয়ে বিয়ের জন্য রাজি হতে হল। তিনি একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঊষাকে দেখে এলেন। সেই প্রথম দেখাতেই তাদের বিয়ের কথাপাকাপাকি হয়ে গেল। তিনি উষাকে তার নিজের হাতের নাম লেখা আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করে এলেন। বাড়ির ভেতর থেকে শাঁখ বেজে উঠল। মেয়েরা উলু দিল।

হেডমাস্টার মশাই আমাদের ইংরিজি পড়াতেন। প্রথম দিন ক্লাসে এলেন গম্ভীরভাবে। ইস্টিশানের সেই প্রশান্তবাবু আর নেই। কারুর মুখে কোনো কথা নেই, যেন নিঃশ্বাসের শব্দটুকু শোনা যায়। তিনি আমাদের একখানা বই নিয়ে বললেন, তোমাদের কি কি পদ্য পড়া হয়েছে?

আমি বললুম, We are Seven, Lucy Gray, The blind boy...

তিনি বললেন, We are Seven হয়েছে? কার লেখা বল দিকি?

সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর।

তিনি বললেন, একজন একজন করে উত্তর দাও। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্বন্ধে তোমরা কে কি জান?

কারুর মুখে কোনো কথা সরল না। তিনি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আচ্ছা তুমি বল দিকি?

আমি বললুম, তিনি প্রকৃতিকে ভালবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে প্রকৃতির প্রাণ আছে।

তিনি বললেন, বেশ বেশ। বল তো এই জায়গাটার মানে কি?

"How many you are, then" said I

"If they two are in Heaven?"

Quick was the little maid's reply

"O Master! We are seven."

অনেকেই তাঁর কথার মানে করে গেল। তিনি তখন বললেন, কেউ আর কিছু জান?

কেউ আর উত্তর করতে পারল না। আমি বললুম, ওই মানে আমরা শিখেছি।

তিনি মৃদু হাসলেন, বললেন, তোমাদের মানে ঠিকই হয়েছে। ওর আর একটা বিশেষ অর্থ আছে।

আমরা সকলে অবাক হয়ে তার পানে তাকিয়ে রইলুম। তখন তিনি আমাদের বললেন, আত্মার অমরত্বের কথা। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে গেলুম। সে ব্যাখ্যা এখনও আমার বেশ মনে আছে। শেষে তিনি বললেন, তোমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় কে?

আমি উঠে দাঁড়ালুম, তিনি বললেন, ওঃ, তোমার সঙ্গেই না সেদিন দেখা হয়েছিল? তোমার নাম নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় না?

বললুম, হ্যাঁ।

এর পর তার সঙ্গে আমার পরিচয় খুব গভীর হয়ে উঠল। তিনি প্রায়ই আমায় ছুটির পর আপিস ঘরে নিয়ে কত সুন্দর সুন্দর বই পড়তে দিতেন। যে জায়গাটা বুঝতে পারতুম না, সেটা কত রকমে কতবার বুঝিয়ে দিতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ"। এখন তোমরা শুধু পড়বে। পড়া মানে যে কেবল বইয়ের পড়া তা নয়, পড়া মানে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে পৃথিবীর চারদিক গভীরভাবে দেখা। জান, নিউটন কি করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন, কি করে গ্যাল্‌ভানি ইলেক্‌ট্রিসিটি আবিষ্কার করেছিলেন, স্নান করতে করতে আর্কিমেডিস্ হায়ড্রোস্ট্যাটিকসের কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন? আমাদের চারপাশে এমন অনেক জিনিস ঘটছে যা আমরা দেখছি শুধু সাদা চোখে, তার সেই পর্দা সরিয়ে রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পাচ্ছি না। বড় হতে হলে চোখ চাই—সব জিনিস বুঝে দেখবার চোখ।

আমরা পরম বিস্ময়ে তাঁর কথা শুনতুম। তিনি বলতেন, দেশ তোমাদের কাছে কিছু চায়। তোমরা দেশের কাছে বলিপ্রদত্ত। দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

আমরা প্রতিজ্ঞা করলুম।

যে মাস্টার মশায়ের বিয়ে করবার আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না, আশীর্বাদের পর তার মধ্যে নতুন উৎসাহ দেখা দিল। অজস্র পয়সা খরচ করে তিনি বিরাট আয়োজন করতে লাগলেন। সারা গ্রামে মহা ধুমধাম পড়ে গেল। আমাদের স্কুল চারদিনের জন্য বন্ধ রইল। কলকাতা থেকে গায়ে হলুদের আগের দিন জিনিসপত্র কিনে আনা হল। কনের জন্য পঁয়তাল্লিশ টাকা দামের একখানা বেনারসী শাড়ি এল। বিখ্যাত জুয়োলারের দোকান থেকে গহনা এল। তারপর দূরান্তর কাঁপিয়ে সানাই বেজে উঠতে লাগল।

গায়ে হলুদ দেখে সকলে তো অবাক হয়ে গেল।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। পাশের গ্রামের হেমন্ত হাজরারা মোটর পাঠিয়ে দিয়েছে বর নিয়ে যাওয়া হবে বলে। সারাদিন ধরে ফুল দিয়ে সেই মোটর সাজান হচ্চে। আমাদের মন আনন্দে ভরে গেছে। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে বসে আমরা তর্ক করছি বরযাত্রী বড় না কনেযাত্রী বড়—এমন সময় দেখি স্কুলের সেক্রেটারি মশাই একজন বেঁটেমত কালো ভদ্রলোককে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি আমায় বললেন, তোর বাবাকে ডেকে দে দিকি।

তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর এবং চিন্তাযুক্ত। আমি বাবাকে ডেকে দিলুম। সেক্রেটারি বললেন, শুনে যান গোষ্ঠবাবু, এই ভদ্রলোক কি বলছেন।

বাবা বললেন, কি কি!

সেক্রেটারি বললেন, এদিকে আসুন। সতীশবাবুর মুখেই ব্যাপারটা শুনবেন।

সতীশবাবু ওরফে সেই কালোমত ভদ্রলোকটির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের কাছে গেলেন। তারা ফিস্ ফিস্ করে কি সব বললেন। বাবার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। তখনই কাকাকে ডাকা হল। তিনি তো মাথায় হাত দিয়েবসলেন। বাড়ির ভেতর মেয়েরা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে চারদিক নিরানন্দে ভরে গেল—সারা গৃহে বিষণ্ণতার ছায়া। সেক্রেটারি মশায় যাবার সময় বলে গেলেন, একেই বলে কলিকাল। নইলে বলুন, মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে পারে না? আজকাল মানুষ চেনা দায়।

ইতিমধ্যে পাড়ার অ্যামেচার ড্রামেটিক ক্লাবের মেম্বাররা এসে দারুণ হৈ চৈ বাধিয়ে দিল। বলল, শাস্তি চাই। আমরা কি সব মরে গেছি? গাঁয়ের মধ্যে একজন এসে যে এই কেলেঙ্কারি করবে তা আমরা কখনই সহ্য করব না। আজ ওর হাঁড় গুঁড়িয়েই ছেড়ে দেব।

সেক্রেটারি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, না না, তোমাদের অত কিছু করতে হবে না। ভদ্রলোকের যা অপমান হবার খুবই হয়েছে। গায়ে যদি মানুষের চামড়া থাকে তো বুঝতে পারবে। কালই সমস্ত কাজ বুঝে দূর করে দেব গাঁ থেকে। তোমরা এই গরিব ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে রক্ষা কর।

তাঁরা সকলে চলে গেলে শুনলুম, হেডমাস্টারকে নিয়েই নাকি এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি। তিনি নাকি বিধবার ছেলে। ওই সতীশবাবু হচ্ছেন তাঁর কাকা। আমার কাকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এ সব ভাগ্য। তা নইলে অমন সোনার টুকরো ছেলের কিনা এই বিচ্ছিরি দোষ?

উষার বহু কষ্টে বিয়ে হল সেই গোধূলি লগ্নেই এই গাঁয়ের মতি বাঁড়ুজ্যের ছেলে কিরণের সঙ্গে। কিরণ তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। যাই হোক, বিয়েতে আমি আনন্দ পাই নি একটুও, এমন কি বিয়েও কখনও এমন বিষণ্ণতার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে আর তো আমি শুনি নি। কোনো প্রকারে সাত পাক ঘুরে মালা বদল করা আর নিঃশব্দে খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ করা।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। চুপ করে বাড়ি বসে থাকতে আর ভাল লাগল না। আস্তে আস্তে ইস্টিশানের ধারে বেড়াতে গেলুম।

সন্ধ্যা হয়েছে। দূরের জিনিস ভাল রকম দেখা যায় না। একটা নারকেল গাছের মাথাটা কাঁপছে, তার পাশ দিয়ে উজ্জ্বল শুকতারাটি দেখা গেল। ইস্টিশানে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। গাড়ি আসছে। ফ্ল্যাগ ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিন হলে হয়তো ছুটে গিয়ে লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ট্রেন দেখতুম...সেটা হয়তো খটাখট খটাখট করে চলে যেত; কিন্তু আজ আমার পা যেন উঠতে চাইছে না! ধীরে ধীরে আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে চলেছি এমন সময়ে দেখি হেডমাস্টার মশাই ঠিক আমার সামনে। তার হাতে একটা সুটকেশ, পেছনে চাকরের মাথায় অন্যান্য জিনিসপত্র। তিনি আমার কাছে এলেন, বললেন, এখানে কি করছ নির্মল? বাড়ি যাও, ঠাণ্ডা লাগবে।

তাঁর মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরুল না। মনে হল এবার বুঝি তিনি কেঁদে ফেলবেন। আমি নিঃশব্দে তার পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকালুম। তিনি আমার পিঠটা বারদুয়েক চাপড়ে সহাস্যে বললেন, বেশ বেশ বেশ।

আমি অতিকষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। তাঁর চোখ চকচক করছে যেন।

নিকটেই ট্রেনের শব্দ শোনা গেল। তিনি ক্ষিপ্র পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। যাবার সময় বললেন, বেশিক্ষণ আর এখানে থেকো না, বিশ্রী হাওয়া দিচ্ছে।

মাত্র মিনিট দুয়েক ট্রেনখানা থামল। তার মধ্যেই ওঠানামা শেষ হয়ে গেল। আবার সেই দুরন্ত ট্রেন হু হু করে ছুটে চলল। মাথার ওপর দিয়ে ডানার ঝটাপটি করতে করতে একটা পেঁচা উড়ে গেল। আমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে কয়েকবিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল।